প্রতিদিন
চুটি
রবিবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৪

সঞ্জয় দাশগুপ্ত
emailsanjaydasgupta@gmail.com

মানবজমিন রইল পতিত

‘ডাঙ্কি’ ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হল ‘ডাঙ্কি রুট’-এর যারা পথিক, তারা কাউকে এভাবে ভালবাসার অবস্থায় থাকে কি? সে-পথ কতটা বন্ধুর, নিষ্করুণ, বিপদসংকুল হতে পারে তা জানার চেষ্টা করেছিলাম আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে। দুঃখজনক বাস্তব হলেও সত্যি যে, মানব পাচার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা।

চতুর্দিক বরফে সাদা। হিমেল আস্তরণের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে সরু পিচের রাস্তা। তাতে সার বেঁধে চলেছে মালবাহী ট্রাক। একটি ট্রাকে, মালের বস্তার মাঝে, ঠাসাঠাসি করে বসে আছে তিন যুবক, এক যুবতী। চলমান ট্রাকে, প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে হঠাৎ তরুণীটিকে নিজের গায়ের কম্বলটুকু দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে সঙ্গের পুরুষ।

লন্ডনের একপ্রান্তে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে ‘ডাঙ্কি’ ছবিটি দেখতে-দেখতে মনে হল ‘ডাঙ্কি রুট’-এর যারা পথিক, তারা কাউকে এভাবে ভালবাসার অবস্থায় থাকে কি? থাকা সম্ভব?

অবৈধ অভিবাসনের যে দীর্ঘ যন্ত্রণার পথটিকে ‘ডাঙ্কি রুট’ বলে দেখানো হয়েছে সিনেমার পর্দায়, সে-পথ কতটা বন্ধুর, কতটা নিষ্করুণ, কতটা বিপদসংকুল হতে পারে তা জানার চেষ্টা করেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। কিছুটা কর্মক্ষেত্রের তাগিদে, কিছুটা নিজের লেখালিখির প্রয়োজনে।

বলিউডের ‘ব্লকবাস্টার’-ও যে এখন ‘অবৈধ’ অভিবাসনের মতো একটা থিম নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এবং একান্ত নিজস্ব একটা ধাঁচে হলেও যথেষ্ট মুনশিয়ানার সঙ্গে এইরকম একটা বিষয়কে চলচ্চিত্র জগতের মূলধারায় নিয়ে এসে ফেলতে পারছে— এটা যথেষ্ট ইতিবাচক, স্বীকার করা প্রয়োজন প্রথমেই।

বলিউড ডাঙ্কি রুটের মধ্যে আবিষ্কার করেছে কাহিনির রসদ। অবৈধ অভিবাসনের এই চড়াই-উতরাইয়ে ভরা যাত্রাপথ কিন্তু নতুন নয়। অবৈধ অভিবাসন বা ‘ইললিগ্যাল ইমিগ্রান্ট’— শব্দবন্ধটি মার্কিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম যে সমস্ত মানুষ অভিবাসনের বিপদ-ভরা পথ পেরিয়ে এসে থিতু হয়, তারা অনেকেই এসেছিল ভিয়েতনাম থেকে। সেই উত্তর ভিয়েতনাম, যেখানে তখন মার্কিন গোলাবর্ষণে উজাড় হয়ে যাচ্ছে গ্রামের-পর-গ্রাম। বাংলা ভাষার কবি লিখছেন—

আমরা যখন ঘড়ির দুটি কাঁটার মতন
মিলি রাতের গভীর যামে
তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে কাঁটা
বোমা পড়ছে ভিয়েতনামে

যুদ্ধের কবল থেকে বাঁচতে সে-সময় উত্তর ভিয়েতনামের গ্রাম থেকে গৃহহীন, উচ্ছিন্ন, মরিয়া নারী-পুরুষের দল স্রেফ ডিঙি নৌকোয় ভেসে পড়ত প্রশান্ত মহাসাগরে, ভাসতে ভাসতে একদিন মার্কিন মুলুকে পৌঁছে যাওয়ার আশায়। স্বপ্নের ঘর বাঁধার আশায়। কত হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এভাবে, কেউ তার হিসাব করেনি কোনও দিন। কিন্তু যারা কোনওভাবে পৌঁছে যেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, ইতিহাস বইয়ের পাতার বাইরে— অদ্ভুত এক ইতিহাসের রচয়িতা সেই মানুষগুলি। এ শতকের গোড়ায় নিউ ইয়র্কে দেখেছি, সেসব মানুষের ছেলেমেয়ে-নাতি-নাতনিরা বর্তমানে ধনী ব্যবসায়ী, অনেকেই ভিয়েতনামি রেস্তোরাঁর মালিক। যাদের কেউ কেউ আবার কোটিপতি।

ফলিত স্বপ্নের এই হাতছানির মর্মান্তিক প্রভাব দেখেছিলাম নয়ের দশকের শেষভাগে, এ বিষয়ে গবেষণা করতে নেমে। নিজস্ব বা পারিবারিক সংগতির প্রায় সবটুকু ‘এজেন্ট’-এর হাতে তুলে দিয়ে ভারত বা বাংলাদেশের কোনও গ্রাম থেকে এ-যাত্রা শুরু হত সেই সময়। খবর পাই, এখনও বহুলাংশে, বাস্তব একই। সেদিনও এ-পথ বন্ধুর ছিল, এখন হয়তো আরও কঠিন হয়েছে। তবে একটা বিষয় হয়তো বদলেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে টের পাই। সেদিন যারা আসত তারা অধিকাংশই পুরুষ— মোটামুটি ১৮-১৯ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স। এখন অনেক তরুণীরাও এ-পথে পা বাড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে ‘ডাঙ্কি’ সঠিক। কিন্তু সেটা কি সাহস? না অসহায়তা? না কি শুধুই রঙিন স্বপ্নের মাদকতা? ‘ডাঙ্কি’-র বলিউডি ফরমুলায় তো এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যাদের যাত্রা শুরু, তাদের প্রথম গন্তব্য পদ্মা বা ইছামতী নদীতীরে কোনও অপেক্ষাকৃত জনবিরল সীমান্ত এলাকা। রাতের অন্ধকারে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নদী পার হয়ে ভারত। ভারতের কোনও গ্রাম থেকে শুরু হলে অবশ্য এই সীমান্ত পেরনোর প্রয়োজন হয় না। তবে বাকি যাত্রাপথটুকু একই। পশ্চিমবঙ্গের কোনও একটা জায়গায় সবাই আবার মিলিত হয়ে বাস বা ট্রেন ধরে কলকাতা। হাওড়া স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে, বা কখনও বাস-ট্রাক বদলে বদলে অমৃতসর অবধি লম্বা সফর। সেখান থেকে এই যাত্রার সবচেয়ে কঠিন অংশ। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পার হওয়া। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক প্রাক্তন কর্মীর মতে, এখানেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ধরা পড়ে। তাদের স্বপ্নের অবসান হয় ভারত বা পাকিস্তানের জেলে। যারা পার হয়ে যায় কোনওমতে, তারা যায় লাহোর। সেখানে থেকে করাচি। সেখানে কোনও এক মালবাহী জাহাজের সাময়িক কর্মী হিসাবে তুরস্কের কোনও বন্দর।

ইউরোপ-জুড়ে ফাস্ট ফুডের দোকানে যত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বিক্রি হয়, তার সিংহভাগ আসে তুরস্ক থেকে। সেই আলুভাজার বস্তা যায় বিশাল আকারের হিমায়িত ট্রাকে। ভিতরে হিমবাহের মতো ঠান্ডা। সেই ট্রাকে আলুর বস্তার ফাঁকে ওঠে অবৈধ অভিবাসনের যাত্রীরা। কয়েকটি কম্বল, স্লিপিং ব্যাগ, কিছু গরম পোশাক-মাফলার-টুপি সম্বল করে। কিন্তু তাতে হিমাঙ্কের বেশ কয়েক ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায় সুস্থ থাকার কথা নয়। থাকেও না অনেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার ঠিক উল্টো পরিস্থিতি। মালবাহী ট্রাকের ভিতরটা অসম্ভব গরম। চতুর্দিক বন্ধ, বন্ধ শুধু নয়, প্রায় সিল্‌ড। শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস ঢোকারও ছিদ্র নেই। ভিতরে যেটুকু বাতাস আছে সেটুকু অক্সিজেনই ভরসা।

২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে, ইংল্যান্ডের গ্রেজ (Grays) নামে একটি ছোট শহরে এইরকমই একটি মালবাহী ট্রাকে ৩৯ জন নারী-পুরুষ এবং শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরাও প্রত্যেকে এসেছিল ভিয়েতনাম থেকে। অন্ধকার ট্রাকের ভিতর প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তারা হয়তো কোনওক্রমে টিকে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু অতগুলি লোকের অতক্ষণ ধরে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস বদ্ধ ট্রাকের মধ্যে ছিল না। এই ঘটনার পর একটি ব্রিটিশ আদালতে ১২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন রুমেনিয়ার মারিউস মিহাই দ্রাঘিচি (Marius Mihai Draghici)। জেরার মুখে স্বীকার করেন যে, বিরাট একটি মানুষ পাচারকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। ব্রিটেনে আসার জন্য মরিয়া ও লালায়িত এমন সব নর-নারীকে বিভিন্ন বেআইনি পথে ব্রিটেনে এনে ফেলে কোটি-কোটি টাকার মুনাফা করে এই সংস্থা।

শুধু ব্রিটেন নয়— জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকী সুদূর অস্ট্রেলিয়াতেও একই চিত্র। এ কাহিনি কোথাও কেউ লিপিবদ্ধ করেনি। কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই সত্যাসত্য যাচাই করার কোনও উপায় নেই।

দুঃখজনক বাস্তব হলেও মানব পাচার এখন একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। সেই অন্ধকার জগতের যারা কারবারি— এসব নিরুপায় নর-নারীর অভিপ্সীত গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার খবর তাদের ‘ডাঙ্কি রুট’-এর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। তাই মানুষ পাচার করার এই ডাঙ্কি রুটে— তুরস্ক মাঝপথের একটা বড় ঘাঁটি হতেই পারে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার রাস্তাটা হবে আফগানিস্তান বা ইরানের ভিতর দিয়ে— এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর। ইরানের জনজীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কর্তৃপক্ষর অভ্যন্তরীণ নজরদারি, তার যেটুকু প্রমাণ বাইরে থেকে পাওয়া যায়, একেবারে নিশ্ছিদ্র বলা চলে। সেখানে মরুভূমির নিরালা প্রান্তরেও তিনজন ইরানি সৈনিককে মেরে ফেলে রেখে ভিনদেশি পথিকেরা নির্বিবাদে এগিয়ে যাবে তাদের গন্তব্যের দিকে, ইরান পার হয়ে পৌঁছে যাবে তুরস্কে, এটা কি সম্ভব?

অবশ্য বলিউড বিনোদনের বিপণন করবে, সেটাই তার কাজ। কিন্তু সিনেমার পর্দা যাই বলুক— এই যাত্রাপথে কোনওভাবেই উত্তেজনার খোরাক নেই— নেই দেশভ্রমণের কোনও অ্যাডভেঞ্চার।
ভালবাসা তো দূর অস্ত। আছে খালি সংশয়।
প্রতি মুহূর্তে বিপদের হাতছানি।

আমাকে যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে এ-পথের কাহিনি শুনিয়েছিলেন বহুদিন আগে, তারা এ-পথ পার হয়ে আসার কুড়ি, পঁচিশ, এমনকী পঞ্চাশ বছর পরও সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। ফিরে তাকাতেও চাননি সেই দিনগুলির দিকে। কেন? এত দিন পরেও কেন নয়? না, এখন তো তাঁদের হাতে মার্কিন, ব্রিটিশ, বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট!

> ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে, ইংল্যান্ডের গ্রেজ নামের ছোট শহরে, একটি মালবাহী ট্রাকে ৩৯ জন নারী-পুরুষ এবং শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এসেছিল ভিয়েতনাম থেকে। অন্ধকার ট্রাকের ভিতর প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় তারা হয়তো কোনওক্রমে টিকে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু অতগুলি লোকের অতক্ষণ ধরে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস বদ্ধ ট্রাকের মধ্যে ছিল না।

তুরস্কের মহিলা চিত্র-সাংবাদিক নিলুফার ডেমির-এর (NilÜfer Demir) ক্যামেরায় ধরা পড়া আলোকচিত্রটি দেখার আগে বুঝতে পারিনি কেন? তারপর ছবিটা দেখলাম। তারিখটা মনে আছে। দোসরা সেপ্টেম্বর, ২০১৫। ছবিটার বিষয়ে কাগজেপত্রে বোধহয় ছাপা হয় তার পরের দিন। আয়লান কুর্দির ছবি। দু’-বছর বয়স ছিল তার। কুর্দি শিশু। তার বাড়ি ছিল সিরিয়ায়। ভূমধ্যসাগর উপকূলে, স্বপ্নের মতো সুন্দর তুরস্কের কোনও সমুদ্রতটে, খোলা আকাশের নিচে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দু’-বছরের আয়লান। টুকটুকে লাল জামা পরা ছোট্ট নিথর দেহটিকে আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। নৌকো করে ভূমধ্যসাগরের বুকে ভেসে পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাকি নৌকোডুবিতে মৃত্যু হয়ে শিশু আয়লান ও তার দাদার। তুরস্ক থেকে নৌকো করে ইউরোপ পৌঁছতে চেয়েছিল আয়লানের বাবা আর মা। দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে। নিলুফার ডেমিরের তোলা ছবিটি যেদিন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, সেদিন শিশুটির নাম কেউ জানত না।

আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ছবিটি?

তরঙ্গে নিথর। ছবি: নিলুফার ডেমির

প্রিয়ক মিত্র
priyakkmitra94@gmail.com

মৃণালদার কলকাতা হারিয়ে যায়নি

‘আমি সেই কলকাতাটা এখনও পাই। কলকাতার কেঅসের মধ্যে আমি এখনও মজা পাই, উপভোগ করি।’ মৃণাল সেন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দিক্‌পাল পরিচালকের সিনেমা-ভুবনের অন্দরমহলের ইশারা দিলেন অঞ্জন দত্ত। শুনলেন প্রিয়ক মিত্র। আজ শেষ কিস্তি।

যে কোনও বায়োপিকে একটা চেহারা বা ভাবভঙ্গির অনুকৃতি থাকে। আপনি কি সেটা সচেতনভাবেই এই ছবিতে অনুসরণ করেননি?

অঞ্জন দত্ত হ্যাঁ। আমি তো জানি মৃণাল সেন কীভাবে বসতেন, টেবিলের উপর পা তুলে। শাওন চক্রবর্তী, যে আমার চরিত্রটা করেছে, ওকেও বলেছি, সংলাপ চাইলে বদলে দিতে পারো, কিন্তু চেষ্টা করো শরীরে একটা অস্থিরতা আনতে। মৃণাল সেন বা আমার— দু’জনের মধ্যেই অস্থিরতাটা ছিল, যেটা আবার দু’জনের স্ত্রী-এর মধ্যে নেই। তাঁরা অনেক শান্ত। কে. কে. মহাজনের কোনও ভিডিও তো নেই। তাই সুপ্রভাত দাসকেও ওই অ্যাটিটিউডটা আনতে হয়েছে। বিদীপ্তা চক্রবর্তীও যখন গীতা সেনের চরিত্রে, সে-ও ওই চরিত্রের ‘স্পিরিট’টি বের করে আনছে।

‘ওয়াক দ্য লাইন’ ছবিতে হোয়াকিন ফিনিক্সকে একেবারে জনি ক্যাশের মতো লাগে না। আবার ‘বোহেমিয়ান র‍্যাপসোডি’ আমার এজন্যই এতটা ভাল লাগে না। তাই বলে ‘বোহেমিয়ান র‍্যাপসোডি’ বা ‘গান্ধী’ খারাপ ছবি তো নয়, কিন্তু ওই ‘লুক অ্যালাইক’ নিয়ে আমার আপত্তি আছে। কারণ পুরোপুরি একটা লোক হয়ে ওঠা বৈজ্ঞানিকভাবেই সম্ভব নয়, দার্শনিক জায়গা তার পরে আসছে। তাই আমার চরিত্রের অ্যাংস্ট ফুটিয়ে তোলা দরকার ছিল শাওনের অভিনয়ে। তাকে নকশাল চেহারার হলে চলবে না, কিছুটা অ্যাংলিসাইজড হতে হবে।

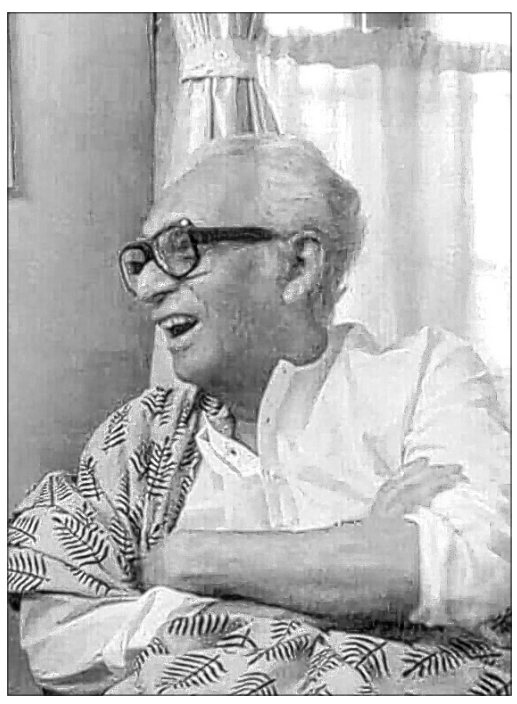

শাওন বামপন্থী, আমি সে-সময় তা ছিলাম না। তাই ওকে কামু-সার্ত্রে পড়িয়েছি, যাতে যে-প্রশ্নগুলো আমার সেই সময় ছিল, সেটা ওর মধ্যেও উঠে আসে। ’৬৮-র ছাত্র আন্দোলনের পর সার্ত্রে যখন মাও জে দং-কে সমর্থন করল, কেন কামুর সংকট দেখা দিল? এভাবে ওকে আমি কিছুটা তৈরি করেছি, আমাকে নকল করতে বলিনি একবারও।

মৃণাল সেন মানে তো ‘মৃণাল সেন’ একা নন। গীতা সেন, কুণাল সেন, কে. কে. মহাজন আছেন, আবার মৃণাল সেনের পারিবারিক সূত্রে অনুপকুমারও চলে আসেন আপনার ছবিতে।

অঞ্জন দত্ত হ্যাঁ, একশোবার। মৃণাল সেনের ছবির শুটিং হলে বহু মানুষ আনন্দ করে খাওয়াদাওয়ার সুযোগ পেত, যা হয়তো তারা সচরাচর পায় না। এটা আমি আমার ছবিতেও দেখিয়েছি। কে. কে. মহাজনও একটা আশ্চর্য চরিত্র। আবার কুণাল তার বাবাকে ‘বন্ধু’ বলে ডাকে, বাবার থেকে হঠাৎ করে হয়তো একটা সিগারেট নিয়ে চলে যাচ্ছে। গীতা সেনের সবসময়ের উপস্থিতি, ওরকম শান্ত থাকা— এসব মিলিয়েই কিন্তু মৃণালদা!

অনেক অভিনেতাই বলেছেন, মৃণাল সেন নিজের ছবিতে সবসময় চিত্রনাট্য খুব অনুসরণ করে চলতেন না। আপনার কাজের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে বলে আপনার অভিনেতারা বলেন। এটা কি মৃণাল সেনের থেকেই পেয়েছেন?

অঞ্জন দত্ত একেবারেই। মৃণাল সেনের সঙ্গে যোগাযোগ না হলে আমি একেবারেই অন্যরকম ছবি করতাম। অন্যরকম গান করতাম। হ্যাঁ, অভিনয়টা আমি আমার মতো করে জানতাম। কিন্তু মৃণালদা শিখিয়েছেন, কিচ্ছু না-করতে কিছু-কিছু সময়। কতটা করব, সেই অঙ্ক বুঝতে। অভিনয়ের এটুকু মৃণাল সেনের থেকে পাওয়া যেমন, তেমন বাকি অনেক কিছুই। এই চিত্রনাট্যর ব্যাপারটাও। সংলাপ তো আর কালিদাসের লেখা নয়! সেটা কোনও অভিনেতা বদলাতেই পারে।

‘খারিজ’-এর সময় দেখেছি, মৃণালদাও চাইছেন, আমি কিছু একটা করি কোনও দৃশ্যে। কী করব, হয়তো উনিও বুঝতে পারছেন না সেই মুহূর্তে, কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছেন না। আমি নিজের মতো করে হয়তো সেই দৃশ্যটাতে অভিনয় করলাম, সেটা আবার ওঁর পছন্দও হয়ে গেল। ‘চালচিত্র’-র সময় আমার মা, যে-চরিত্রটা গীতা সেন করছেন, উঠোনের শ্যাওলায় পড়ে যাচ্ছে। আমি দৃশ্যটা দেখে হেসে ফেলছি। সেটা কিন্তু উনি পছন্দ করছেন, চিত্রনাট্যের অংশ না-হওয়া সত্ত্বেও। আবার কিছু জিনিস জানতেনও। যেমন— প্রচণ্ড গাড়ির মধ্যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আমার চরিত্র দীপু, সে কীভাবে হাঁটবে, সেটা বলে দিচ্ছেন। আমি আনস্মার্টলি হেঁটে আসছি দেখে খুব রেগে গিয়েছিলেন মনে আছে। শেষ দৃশ্যে আমি কাঁদতে-কাঁদতে হাঁটছিলাম, সেটা উনি মোটেই মেনে নিচ্ছিলেন না। এই যে স্বাধীনতা দেওয়া, আবার না দেওয়া— এটাই শেখার।

> ‘ওয়াক দ্য লাইন’ ছবিতে হোয়াকিন ফিনিক্সকে একেবারে জনি ক্যাশের মতো লাগে না। আবার ‘বোহেমিয়ান র‍্যাপসোডি’ আমার এজন্যই এতটা ভাল লাগে না। তাই বলে ‘বোহেমিয়ান র‍্যাপসোডি’ বা ‘গান্ধী’ খারাপ ছবি তো নয়, কিন্তু ওই ‘লুক অ্যালাইক’ নিয়ে আমার আপত্তি আছে।

মৃণাল সেন, মৃণাল সেনের কলকাতাকে আপনি কতটা ‘মিস’ করেন এখন?

অঞ্জন দত্ত সত্যি কথা বলব? আমি সেই কলকাতাটা এখনও পাই। কলকাতার কেঅস-এর মধ্যে আমি এখনও মজা পাই, উপভোগ করি। সবকিছু নিয়েই তো শহরটা চলেছে, সব তো ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! এত নিউজ চ্যানেল, এত ডিজিটালের মধ্যেও এখনও লোকে খবরের কাগজ পড়ছে। হয়তো যে মিছিলগুলোর জন্য ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছিল, সেই মিছিলগুলো পাল্টে গিয়েছে। মিছিলের জন্য যানজট হচ্ছে, তা-ও এই শহরটার মধ্যে অনেক কিছু পাই। মৃণাল সেনও এই শহরটাকে শেষ দিন পর্যন্ত ভালই বেসে গিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ‘চালচিত্র এখন’। কোরিয়ার বুসানে দর্শক এতটা উত্তেজিত হয়তো হতই না এই ছবিটা নিয়ে। কলকাতা ছবিটাকে যেন পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিল। কলকাতার এখনও সেই ক্ষমতা আছে। কলকাতা-ই তো ‘ভুবন সোম’ বা ‘কলকাতা ৭১’ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো রাস্তায় এখনও হইহই করে নেমে পড়ে না পুরো শহর, হয়তো দুম করে রাস্তায় একটা নাটক বা গান শুরু হয়ে যাচ্ছে না। আমি কলকাতার তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাঁটি মিস করি। সেই তার্কিক কলকাতায় সবকিছুর পরেও সবাই একসঙ্গে একটা মিছিলে হাঁটতে পারত। হয়তো ভিতরে ভিতরে এখনও তা-ই হচ্ছে। কিন্তু সমান্তরাল সংস্কৃতি যেন কিছুটা অনুপস্থিত। তবে এই শহরের মানুষগুলোকে আমি এখনও চিনতে পারি। আমি এখনও এই শহরটায় হেঁটে বেড়াই, বড়বাজার বা বো ব্যারাকের বিভিন্ন রূপ-রস-গন্ধ পাই। যে-শহরে মৃণাল সেন ছিলেন, সেই শহর এখনও হারিয়ে যায়নি।